



বর্মাতে ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা: ১৮৮৬-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ

পারমিতা দাস

সহযোগী অধ্যাপক, চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.08.2026; Accepted: 29.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The previous name of Myanmar was Burma. Before 1885, Burma was not a part of British India. Following the British conquest of Upper Burma in 1885, Burma was incorporated into British India and remained so until its separation in 1937. After 1885, Indian migration to Burma resumed in a new form. Many Indians, including educated unemployed people, migrated there in search of employment, while Indian nationalists settled in Burma to carry out anti-colonial activities. Consequently, Burma emerged as an important centre of Indian nationalist activities. Later, communists from both India and Burma fought together against British imperialism. During the 1940s, Burma also became an important base for the Indian freedom movement under the leadership of Netaji Subhas Chandra Bose. Although this movement was ultimately unsuccessful, it left a significant impact on the anti-colonial struggle. This article analyses how Burma became a safe and strategically important centre for Indian anti-colonial activities during the period from 1885 to 1947.

Keywords: Burma, Indian Nationalism, Anti-Colonial Movement, British Imperialism, Netaji Subhas Chandra Bose

ভারতের সঙ্গে বার্মা বা আজকে যার নাম মায়ানমার তাঁর সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ১৯৮৯ সালের আগে পর্যন্ত এই দেশটির নাম বার্মা ছিল। অবশ্য ঐতিহাসিক ডব্লিউ এস দেশাইয়ের মতে, মায়ানমারের প্রকৃত নাম মায়ানমার পি, যা পরবর্তীকালে বার্মা নামে পরিচিত হয়েছে।^১ প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগ থেকে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বেশিরভাগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে তাই কোয়ারিচ ওয়েলস “Indianised Southeast Asia” কথাটি ব্যবহার করেছেন।^২ প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই তাই বাণিজ্য, ধর্ম, আইন ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারত ও বার্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে বার্মার উপর ও সেখানকার ভারতীয়দের উপর।

চৈনিক কথা ‘মেইন’ থেকে বার্মা কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। ভারতীয়রা বার্মার অধিবাসীদের নামকরণ করেছিলেন ‘ব্রহ্ম’। বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুযায়ী বার্মার মানুষেরা পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী।^৩ প্রাচীন যুগে এই দেশের নাম লেখা হত ম্রাম্মা বলে কিন্তু উচ্চারণ করা হত বামা বলে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও চৈনিক গ্রন্থ বর্মাকে ‘সুবর্ণভূমি’ বলে বর্ণনা করেছেন।^৪ কারণ খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতীয় বণিকরা নিম্ন বর্মার এবং মালয় উপদ্বীপে যেত সোনা এবং টিনের সন্ধানে।^৫

প্রাচীন যুগে সাধারণত: সমুদ্র পথে বর্মার যাওয়া হত। বাংলা থেকে আরাকানের মাধ্যমে একটি স্থলপথ জানা ছিল। কিন্তু স্থলপথ খুব দুর্গম ছিল।^৬ ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় বণিকরা বর্মাতে স্থায়ীভাবে বসবাস

করতে শুরু করে। এই সময় থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধরা স্থায়ীভাবে পাড়ি জমাতে থাকে বর্মাতে। রাশিয়ান পর্যটক আথানিয়াস নিকিটিন ১৪৬৮ থেকে ১৪৭০ সালে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পেগু ছিল খুব ব্যস্ত বন্দর পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এবং সেখানে ভারতীয় বণিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল।^১

বর্মাতে ভারতীয়দের অভিবাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম এই দেশে এসেছিল এবং তাঁর স্থায়ী প্রভাব ছিল। রাজা থেকে সাধারণ মানুষ সবাই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যদিও প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রথমে বর্মাতে এসেছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম বার্মা বা বর্তমান মায়ানমারের ধর্ম বলে স্বীকৃত।

ভারতীয় অভিবাসনের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায় বর্মাতে ব্রিটিশদের অনুপ্রবেশের ফলে। এই সময় থেকে ভারত ও বর্মা একই প্রকার রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণের সম্মুখীন হতে থাকে। ভারতের মতো বর্মাতেও ইংরেজরা প্রথমে পর্যটক হিসেবে, পরে বণিক হিসেবে গিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ: তাঁরা সেখানে ঔপনিবেশিক প্রভুতে পরিণত হয়। প্রথমে তারা বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করে এবং পরে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করে। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ভারতে কোন রাজবংশের থেকে কোন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই সময় বর্মার পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। বর্মাতে কোনবং রাজবংশের রাজা আলংপায়া খুব আগ্রাসী ছিলেন। তাঁর থেকে ব্রিটিশ রাজকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটি ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বর্মা দখল সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৮৮৬ সালে।

বর্মা দখলের পর দুই ধরনের ভারতীয়রা সেখানে গিয়েছিল। একদল ভারতীয় অরাজনৈতিক ভারতীয় যারা মূলত: কাজের সন্ধানে বর্মা পাড়ি দিয়েছিল। আরেক দল ভারতীয় যারা মূলত: জাতীয়তাবোধের আদর্শ ছড়াতে বা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য সেই দেশে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” উপন্যাসে এই দুই ধরনের ভারতীয়দের কথাই পাওয়া যায়। ভারতীয়দের বর্মার মানুষরা বলত ‘কালা’ নামে। অমিতাভ ঘোষের ‘Glass Palace’ গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন সমুদ্র পেড়িয়ে আসাকে ‘কালা পানি’ পেড়িয়ে আসা বলা হত। ‘কালা পানি’ পেড়িয়ে ভারতীয়রা বর্মাতে যেত তাই তাঁদেরকে বর্মীরা ‘কালা’ বলত।

এই সময় ভারতীয়রা তাঁদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বর্মাতে যায় নি। অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসে সেই সময়কার বর্মার চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, বর্মাতে সেই সময় একটি রাস্তা ছিল যা বৃদ্ধ মুঘল সম্রাটের নামে নামাঙ্কিত। অনেক ভারতীয়রা সেখানে থাকত। প্রকৃতপক্ষে, রেঙ্গুনে বর্মীদের থেকে ভারতীয়দের সংখ্যা বেশী ছিল। ব্রিটিশরা তাঁদের নিয়ে এসেছিল বন্দরে, কারখানায় কাজ করানোর জন্য, রিক্সা টানার জন্য ইত্যাদি। তাঁরা স্থানীয় মানুষদের পান নি এই কাজ করার জন্য।^২

ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসেবে বর্মা লর্ড ম্যাকলের ১৮৩৫ সালের মিনিট অব এডুকেশন অনুসরণ করত। তাই ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা নীতি গ্রহণ করেছিল। রেঙ্গুন ছিল সবচেয়ে স্বাক্ষর প্রদেশ। সেখানে সবচেয়ে ধনী বর্মীরা বাস করত। ১০০০ জন বর্মীর মধ্যে ৮২০ জন ছিল স্বাক্ষর। কিন্তু বর্মার তুলনায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তখন বেশী ছিল।^৩ ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান গ্রহণ করেছিল কিন্তু বর্মার মানুষরা তাদের চিরাচরিত শিক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে আসে নি।^৪ ১৮৭৩ সালে রেঙ্গুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। কিন্তু বর্মী ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।^৫ ১৯০৪ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী বাংলা, আসাম এবং বর্মা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছিল। ১৯০৬ সালে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিল ৭,১৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে বর্মার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৪৭, যার মধ্যে পাশ করেছিল ৭১ জন।^{১২} রেঙ্গুন কলেজ ১৯২০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বর্মা গিয়েছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন সেখানে গুজরাটি, পাঞ্জাবী এবং মাদ্রাজি মানুষ অনেক ভীড় করেছিল। তার মাঝখানে রঙিন পোশাক পরিহিত বর্মার মানুষদের বিদেশী মনে হচ্ছিল।^{১৩} উনিশ শতকের শেষের দিকে সেখানে ভারতীয় কুলিরা অনেকে গিয়েছিল মূলতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা থেকে এবং ছাড়াও চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে বাঙালি মুসলিমরা গিয়েছিল।^{১৪} এছাড়া গিয়েছিল নাটুকোটাই চেট্টিয়ার মাদ্রাজ থেকে যারা ছিল তামিলনাড়ু প্রদেশের নাকারাত্তার।^{১৫} তাঁরা বর্মার অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল প্রচুর পরিমাণে। তাঁদের ছাড়া বর্মার অর্থনীতির রূপান্তর সম্ভব ছিল না।^{১৬} শিক্ষিত ভারতীয়রা বিশেষতঃ বাঙালিরা গিয়েছিল চাকরির সন্ধানে। ব্রিটিশ ভারতে কেরানির চাকরির চাহিদা ছিল এবং এই পদে ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালিদের ভূমিকা খুব বেশি ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই দেশীয় কেরানিদের ছাড়া চালানো অসম্ভব ছিল। তাঁরা ছিল ব্রিটিশদের অনুগ্রহভাজন তাই নির্ভরযোগ্য শ্রেণী। এদেরকে অরাজনৈতিক অভিভাসনকারী বলা যায় কারণ এরা ব্রিটিশ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল না।

উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন ভারতে জাতীয় কংগ্রেস গড়ে উঠেছিল এবং ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ডেউ বর্মাতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় বর্মাতে তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অভিভাসন হয়েছিল। এই সময় ভারতীয়রা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল যা বাইরে থেকে ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান মনে হলেও তা ছিল জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। যেমন-১৯০০ সালে ২৩ নম্বর ফায়ার স্ট্রীটে “দ্য বেঙ্গল ক্লাব” গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের চোখে এই প্রতিষ্ঠান ছিল একটি ভয়ংকর সন্দেহজনক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।^{১৭} আর একটি প্রতিষ্ঠান, “বার্মা প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি” ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০। পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাথে একত্রিত হয়ে বর্মীদের নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বাংলার মাটিতে গড়ে তুলেছিল।^{১৮}

১৯০৬ সালে ইয়ং মেন্স বুদ্বিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছিল বর্মীরা। বর্মাতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুনর্জাগরনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯১৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান মন্টেগু-চেমসফোর্ডের দরবারে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। ১৯২০ সালে ভারতে আইনসভার নির্বাচন বয়কট করেছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল ১৯২০ সালের ৫ই ডিসেম্বর মাসে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতালের মাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হবার ঠিক চারদিন পর।^{১৯} এই বিতর্কিত সংস্কার বর্মাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক স্বার্থ, ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে করা হয়। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে বর্মার জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের প্রবেশ হয়।

ক্রমশঃ বর্মা ভারতের বিপ্লবী রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বর্মা ব্রিটিশ ভারতের সাথে যুক্ত হবার ফলে বিপ্লবীরা তাঁদের কাজের আর আশ্রয়ের একটা নতুন জায়গা খুঁজে পায়। বিংশ শতকের প্রথম দিকে একদিকে বাংলার বিপ্লবী অন্যদিকে গদর বিপ্লবী, সবার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এই দেশ। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় গদর বিপ্লবীরা জার্মানদের সাহায্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেছিল। ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য থাইল্যান্ড, বর্মা, সিঙ্গাপুর-মালয় এই অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। গদর ও বাংলার বিপ্লবীরা যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। বেশিরভাগ বাংলার বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলার চিটাগং, ঢাকা, খুলনা, ফরিদপুর, চন্দননগর থেকে এসেছিল এই দেশে।^{২০} মাতৃভূমির বাইরে কাজের অনেক স্বাধীনতা ছিল এবং

সামাজিক নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত ছিল। তাই দেশের বাইরে দরিদ্র এবং শিক্ষিত মানুষরা অনেক আগে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল।

১৯১৫ সালের মার্চে, হেরম্বলাল গুপ্ত জার্মানীর বার্নস্টফ কোম্পানীকে ৮০০ রাইফেল, ২০০০ রিভলভার, কিছু মেশিন গান ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পাঠানোর অনুরোধ করে। এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে বার্নস্টফ জার্মানির বিদেশ বিভাগকে অস্ত্র পাঠানোর অর্ডার দেন। ২০,০০০ ডলার খরচা করা হয় অস্ত্র কেনার জন্য। সেই সময় তারা বর্মা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছিল গদর বিপ্লবীদের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য। মানিলা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং অস্ত্র নিয়ে আর ভারতে পৌঁছতে পারে নি।^{২১}

গদর বিপ্লবী ছাড়াও যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতি, New Violence Party, এবং Bengal-Burma Terrorist Party খুবই সক্রিয় ছিল ওখানে। রেঙ্গুন ছিল মূল কেন্দ্র কিন্তু সেখান থেকে বিপ্লবী কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছিল ইঙ্গেন, মান্দালয় ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায়। বিপ্লবীরা সেখানে বিপ্লবী কাজের জন্য চুরি, ডাকাতি, পিকেটিং, অস্ত্র পাচার সব কিছুই করত। বাংলার যুগান্তর দল টঙ্গু, মৌলমেইন ইত্যাদি জায়গায় তাঁদের শাখা অফিস খুলেছিল।^{২২} শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর “পথের দাবী” উপন্যাসে বর্মাতে বাঙালীদের অভিবাসন এবং সেখানে বিপ্লবী কর্মকান্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বই তাই ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ‘পথের দাবী’ বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করে পুলিশ কমিশনার ১৯২৬ সালের ২৩ শে নভেম্বর চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখেছিলেন। কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে এই বইটির এক কপি পাঠানো হয়েছিল। তিনি বইটি পড়ে জানিয়েছিলেন যে বইটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য।^{২৩} বইটিতে বলা হয়েছিল বার্মার কুলি মজুরদের ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। লেখক সেখানে বার্মার বিপ্লবীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন বিপ্লবকে সফল করবার জন্য সেখানকার বাঙ্গালী যুবক ও যুবতীদের আত্মত্যাগের কাহিনী। তবে বিপ্লব মানেই ‘কাটাকাটি, রক্তারক্তি নয়’ এমন কথাও বলা হয়েছে।^{২৪} আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯২৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি এবং ১৩ই জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল “ক্যালকাটা গেজেট”^{২৫}—

“In exercise of the power conferred by section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal Amendment Act 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled ‘Pather Dabi’ written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyaya, printed by Satya Kinkar Bandopadhyaya cotton press, 51, Harrison Road, Calcutta and published by Sri Umaprasad Mukhopadhyaya on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the government established by Law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code.”

শুধুমাত্র ভারতের বিপ্লবী না, গান্ধীজির দ্বারাও বর্মার জাতীয়তাবাদীরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতে গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্রিটিশ পণ্য, স্কুল, কলেজ, আদালত বয়কটের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ১৯২৯ সালের ৮ই মার্চ, All Burmese Association এর জেনারেল কাউন্সিলের মিটিং-এ বলেছিলেন শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করে লাভ নেই। বয়কট করতে হলে সমস্ত বিদেশী পণ্য বয়কট করা উচিত।^{২৬}

বর্মার মানুষরা গান্ধীজীকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে ভারতীয়রা বর্মার জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনকে উৎসাহিত করে নি। তিনি এর উত্তরে, ভারতীয়দের বলেছিলেন, বর্মার মানুষদের সাথে মিশে যেতে এবং বর্মীদের উৎসাহিত করেছিলেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে।^{২৭}

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে কিছুটা স্বশাসন দেওয়া হলেও বর্মাকে সেই এক সুবিধা দেওয়া হয় নি বলে বর্মার অনেক মানুষ অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন অনুযায়ী দ্বৈত শাসন বা Dyarchy দেওয়া হল। এর ফলে ভারত ও বর্মার মধ্যে মানসিকভাবে বিভাজন তৈরি হল, ঠিক যেমন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্রিটিশ নীতি বিভাজন তৈরি করেছিল। বর্মার একদল মানুষ এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং কেউ কেউ এই বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ছিলেন। ১৯৩২ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে এই বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যারা বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ছিল, তারাই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু তবু বিচ্ছিন্নতা এড়ানো যায় নি কারণ ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন সুপারিশ করে ফেলেছিল এবং ১৯৩৫ সালের ৩০শে মে বর্মার নতুন সংবিধান অনুমোদনের পর ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল বর্মা, ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়।

১৯৩০-এর দশক থেকেই বর্মা এবং ভারত উভয় মানুষরাই কমিউনিস্ট আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই সময় বর্মার সায়া সান বিদ্রোহকে বাংলার বিপ্লবীরা সমর্থন করেছিল নৈতিকভাবে। এই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা জেলে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ‘যুগান্তর’, অনুশীলন সমিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা গঠন করেছিল বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ‘দো বামা’ যার অর্থ আমাদের বার্মা।^{২৮} ১৯৩৭-৩৮ সালে অং সানের নেতৃত্বে থাকিন আন্দোলন রেপ্পনের সমস্ত কলেজে হরতাল ঘোষণা করে। সেই সময় তারা সুন ইয়াং সেন, রুশ সিন ফিনের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই সময় প্রথম মার্ক্সবাদী লেখা বর্মী ভাষায় অনুবাদ হয়।^{২৯} এই সময় বর্মাতে যে সব ভারতীয়রা কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হরিনারায়ণ ঘোষাল, তাঁদের উদ্যোগে রেপ্পনের বার স্ট্রীটে ১৯৩৯ সালের ১৫ই অগাস্ট Communist Party of Burma প্রতিষ্ঠিত হয়।^{৩০}

বর্মার মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। মান্দালয় জেলে থাকার সময় বর্মার সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।^{৩১} ১৯৩৮ সালে সুভাষ বোস যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন দো বামা আসিয়ান তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তাঁর বই “The Indian Struggle 1920-24” থাকিনদের প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।^{৩২} ১৯৩৯ সালের মে মাসে সুভাষ বোসের ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল “Burma Freedom Block”। ডাঃ বা ম ছিলেন এর সভাপতি এবং অং সান ছিলেন এর সম্পাদক। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেও সুভাষ বোসের গ্রেফতারের পর তারা আর একসাথে কাজ করতে পারেন নি।

সুভাষ বোস আবার বর্মার মাটিতে ফিরে এসেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য ১৯৪০র দশকে এবং সেই সময় তিনি পেয়েছিলেন বর্মার মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর সমর্থন। আজাদ হিন্দ ফৌজের Provisional Government প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। তারপর স্থানান্তরিত হয়েছিল বর্মাতে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে। শুধু তাই না রাণী ঝাঁসি ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে।^{৩৩} সুভাষ বোস ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই আজাদ হিন্দ রেডিওতে গান্ধীজির উদ্দেশ্যে বলেন, (“India’s last war of independence had begun...Father of our Nation! In this holy war of India’s liberation, we ask for your blessing and good wishes.”) “জাতির পিতা ভারতের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতের মুক্তির এই পবিত্র যুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চাইছি।”^{৩৪} এখান থেকেই তাঁর

নেতৃত্বে বর্মার মাটি থেকে ভারতকে ব্রিটিশ শাসন করার সংগ্রাম শুরু করেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনী। ১০০০ মহিলা নিয়ে রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্ট এবং ২০০ জন মহিলা নিয়ে চাঁদ বিবি নার্সিং দল গঠন করেছিলেন। ঝাঁসি রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মী সহগাল।^{৩৫} তাঁদের ইফল অভিযানে অংশ নেবার কথা ছিল। তাঁদের গেরিলা যুদ্ধ এবং রাতের যুদ্ধ কৌশল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি বাহিনীর দায়িত্বে ছিল শাহ নাওয়াজ খান। জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে ইন্দো-বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার এবং ইফল অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।^{৩৬} কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপানের থেকে আর সামরিক সাহায্য পায় নি। তাই ইফল অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। ঝাঁসি রেজিমেন্টের সদস্যরা ম্যালেরিয়া, আমাশয় ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। জাপানীরা ভারতীয়দের সাথে বৈষম্য মূলক আচরণ করে। ভারতীয়দের তাঁরা রেশন, অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাঁদের দিয়ে জাপানীদের বিভিন্ন কাজ করাতে থাকে তার ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে।^{৩৭} ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ থেকে পশ্চাদপসরণ শুরু হয়েছিল যা চলেছিল ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এক বছর শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রত্যাৰ্ণ করে।^{৩৮} ১৯৪৫ সালের মে মাসের ইফল অভিযানের পর রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয় এবং তার সদস্যদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নেতাজী, 'Burma National Army'-র সাথে একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন দেশকে বাঁচানোর। কিন্তু তাঁদের এই যৌথ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

এইভাবে দেখা যায় ১৮৮৫ সালের পরে বর্মা ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নতুন কর্মভূমি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্র। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে বর্মার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল বর্মার সংযুক্তিকরণ থেকে বর্মার ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরেও। গুপ্ত বিপ্লবী নেতা, কমিউনিস্ট নেতা, গান্ধীবাদী থেকে শুরু করে নেতাজীর নেতৃত্বে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হয়েছিল বর্মার মাটি। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে যে ভারত-বর্মা সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল তা ঔপনিবেশিক যুগে পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক বন্ধনে। এই দেশের মাটিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এক সাথে সফল করার জন্য বিভিন্ন ভাবধারার রাজনৈতিক বন্ধনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু দুই দেশের শিক্ষাগত ভাবধারার পার্থক্য, সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য ক্রমশঃ দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি করছিল। এই দূরত্বের ব্যবধান শেষ বারের মত কমাতে সফল হয়েছিলেন নেতাজী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতাজীর আন্দোলনের ব্যর্থতা ও তাঁর রহস্যজনক অন্তর্ধান আবার দুটি দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদকে ফিরিয়ে এনেছিল। দুই দেশের শত্রু ব্রিটিশ রাজ হলেও দুই দেশের স্বাধীনতা আলাদা সময়, আলাদা ভাবে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরের বছরেই ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বর্মা স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা লাভ যেমন হিন্দু-মুসলিম দূরত্ব বাড়িয়েছিল তেমনি বর্মার স্বাধীনতা লাভ ভারতীয় ও বর্মার মানুষদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েছিল। বর্মার অর্থনীতিতে ভারতীয়দের অনেক অবদান থাকলেও স্বাধীনতা লাভের পরে বেশিরভাগ ভারতীয়কে বর্মার মাটি থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

- ১। দেশাই, ডব্লিউ. এস.। এ পেজ্যান্ট অব বার্মিজ হিস্ট্রি। ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৬১, পৃ. ১০।
- ২। ওয়েলস, কোয়ারিচ। দ্য ইন্ডিয়ানাইজেশন অব চায়না অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া। বার্নার্ড কোয়ারিচ, ১৯৬৭, পৃ. ১২।
- ৩। ফায়ার, আর্থার। হিস্ট্রি অব বার্মা। লন্ডন: ওয়ান স্টেড, ১৮৮৩, পৃ. ২।
- ৪। হ্যারিসন, ব্রায়ান। সাউথইস্ট এশিয়া: এ শর্ট হিস্ট্রি। ম্যাকমিলান, ১৯৬৬, পৃ. ১০।
- ৫। তদেব, পৃ. ২৫।
- ৬। দেশাই, ডব্লিউ. এস.। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১।
- ৭। মুখার্জি, সুধাংশু বিমল। বার্মা অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট। রঞ্জন প্রকাশন, ১৯৭৭, পৃ. ২১।
- ৮। ঘোষ, অমিতাভ। গ্লাস প্যালেস। হার্পার কলিন্স, ২০০০, পৃ. ৮৯।
- ৯। সেইন, মা মায়া। বার্মা। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৪, পৃ. ২২-২৩।
- ১০। সু চি, অং সান। বার্মা অ্যান্ড ইন্ডিয়া। অ্যালাইড পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃ. ১৮।
- ১১। তদেব পৃ. ১৮।
- ১২। ব্যানার্জি, প্রমথনাথ; রায় নিহাররঞ্জন; গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র; বসু, অতীন্দ্রনাথ; গুহ, বীরেশচন্দ্র; দাশগুপ্ত, অমরপ্রসাদ এবং সিনহা, নরেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পা.), হানড্রেড ইয়ার্স অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ২১৫-২১৮।
- ১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'জাপানে পারসে'। বিশ্বভারতী, ১৯৪১, পৃ. ১২০।
- ১৪। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম। সমাজতন্ত্রের অগ্নিপারীক্ষা ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। পুস্তক বিপনি, পৃ. ৬২।
- ১৫। রুডনার, ডেভি।, কাস্ট অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া: দ্য নাটুকোটাই চেট্রিয়ার্স। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, পৃ. ৮১।
- ১৬। বার্মা প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি। গভর্নমেন্ট অব বার্মা, ১৯৩০, পৃ. ৫০।
- ১৭। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া। লিস্ট অব পলিটিক্যাল। কোয়াসি পলিটিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস সোসাইটি ইন বার্মা। হোম পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ফাইল নং ১২১/১৯১৯, পৃ. ৩২।
- ১৮। তদেব।
- ১৯। স্মিথ, মার্টিন। বার্মা: ইনসার্জেন্সি অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অব এথনিসিটি। হোয়াইট লোটার্স, পৃ. ৪৯।
- ২০। মুখার্জি, সুস্মিতা। দ্য বেঙ্গলি রেভলিউশনারিজ ইন বার্মা: ১৯২৩-৩৩। প্রসিডিংস অব দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, খণ্ড-২, ৬১তম অধিবেশন, ২০০১, পৃ. ১১০৫।
- ২১। বসু, এ. সি.। ইন্ডিয়ান রেভলিউশনারিজ অ্যারড: ১৯০৫-২৫। ভারতী ভবন, ১৯৭১, পৃ. ১৩৭-১৪০।
- ২২। মুখার্জি, সুস্মিতা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০৬।
- ২৩। কর, শিশির। ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৯৮।
- ২৪। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। পথের দাবী। দেজ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ১৭৯।
- ২৫। কর, শিশির। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।
- ২৬। রাজশেখর। মিয়ানমারের ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ১৯০৬-৪৮ অ্যান্ড ইন্ডিয়া। সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৫৩।
- ২৭। তদেব।

২৮। স্মিথ, মার্টিন। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

২৯। তদেব।

৩০। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

৩১। বসু, সুভাষচন্দ্র। ইন বার্মিজ প্রিজন্স: কেরেসপন্ডেন্সেস। পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০৯, পৃ. ৮৭।

৩২। ঘোষ, সুনীতিকুমার। সুভাষচন্দ্র অ্যান্ড গান্ধিয়ান লিডারশিপ। স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৯৯৮, পৃ. ১১৫।

৩৩। সেহগল, লক্ষ্মী। তদেব, পৃ. ২।

৩৫। চন্দ্র, বিপন। ইন্ডিয়াস স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেনডেন্স। পেঙ্গুইন, ১৯৮৯, পৃ. ৪৭২।

৩৬। তদেব।

৩৭। তদেব।

৩৮। তদেব।